ইউনিট-৭

মৎস্য সম্পদ

ভূমিকা

নদী-নালা, খাল-বিল, দিঘি-পুকুর, সাগর-মোহনা নিয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো মৎস। মাছ যেমন মানুষের পুষ্টি যোগায় তেমনি এদেশের মানুষের কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। প্রতিদিন বাংলাদেশের মানুষ যে পরিমাণ প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করে, তার প্রায় ৮০ শতাংশই আসে মাছ ও মৎস্যসম্পদ থেকে। বাংলাদেশের জলবায়ু এবং জলাশয় মাছ চাষের জন্য খুব উপযোগী। এক হিসেবে দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রায় ১২ লক্ষাধিক পরিবার সরাসরি মাছ চাষের সাথে জড়িত। শুধু তা-ই নয়, দেশের প্রায় ১ কোটি পরিবার কোন না কোনভাবে মাছ চাষসহ মাছ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। এদের সামগ্রিক কর্মকান্ডে শুধু যে দেশের মানুষ প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি পাচ্ছে, তা-ই নয়, দেশের বিস্তৃত জলসম্পদ সামগ্রিকভাবে দেশের পরিবেশকে উন্নত রাখার কাজে সহায়তা করছে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সূত্রমতে, দেশে ১৯৯৪-৯৫ সালে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১২ লক্ষ টনে উন্নীত হয়েছে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বর্তমানে মাছ চাষের জন্য নানা ধরণের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব উন্নত প্রযুক্তি দেশের আপামর জেলে গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরের নানা ধরনের কর্মসূচি ও সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার দেশের মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় নানা ধরনের আইন-কানুন তৈরি এবং প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকাতেও নানা ধরনের মাছ চাষের পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা চলছে। গত কয়েক বছরে দেশের উপকূল এলাকায় চিংড়ি চাষের উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে দেশে চিংড়ি চাষের কারণে আয়ও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ইউনিটে– মাছের গঠন, মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাওয়ার কারণ, মৎস্য আইনের বিভিন্ন ধারা এবং বিভিন্ন মাছ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-৭.১ : মাছের সংজ্ঞা, মাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাছের গুরুত্ব

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাছের সঠিক সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- মাছের দেহের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মাছ কি ?

'মাছ' শব্দটিকে এক কথায় ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীকে সহজভাবে চেনা ও উপস্থাপনার জন্য কতকগুলো বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করা হয়েছে, যাদের সাহায্যে খুব সহজেই একটি প্রাণীকে অন্য একটি প্রাণী থেকে পৃথক করা যায়। মাছের ও এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য অনুরূপ প্রাণী থেকে মাছকে পৃথকভাবে চিনিয়ে দেয়। মাছের এ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

(ক) শীতল রক্ত (খ) জলজ (গ) মেরুদন্ডী প্রাণী (ঘ) অভ্যন্তরীণ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালনা করে (ঙ) জোড় বিজোড় পাখনার সাহায্যে চলাচল করে।

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব ধরনের মাছই উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বহন করে।

মাছের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্যান্য আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন−

১। মাছের দেহের সামনের দিক এবং লেজের দিকটা সামান্য সরু। এ ধরনের দেহ গঠনের ফলে মাছ খুব সহজেই পানিতে সাঁতার কাটতে পারে।

২। অন্যান্য জীবের মতো মাছেরও স্ত্রী ও পুরুষ রয়েছে।

৩। মাছের রক্ত পরিবেশের তাপমাত্রার উঠা-নামার সাথে সাথে উঠা-নামা করে।

৪। মাছের রক্ত লাল কারণ এদের রক্তে হিমোগ্লোবিন রয়েছে।

৫। মাছ জলজ জীব, পানিতে বসবাস এবং জীবন ধারন করে। ফলে পানি থেকেই এদের অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। এজন্য এদের মুখের ঠিক পেছন দিকে ফুলকা রয়েছে। এসব ফুলকার সাহায্যে মাছ পানি থেকে অক্সিজেন নিতে পারে। আবার অনেক মাছ রয়েছে, যেগুলো পানির বাইরেও দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে। এসব মাছের দেহে অতিরিক্ত শ্বাসঅঙ্গ রয়েছে। এসব অঙ্গের ভেতর এরা এ বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। খানিকটা বাতাস ধরে রাখতে পারে। ফলে ডাঙাতে অর্থাৎ পানির বাইরেও এরা খানিকটা সময় বেঁচে থাকতে পারে এ ধরনের মাছের মধ্যে পরিচিত মাছ হচ্ছে− কই, মাগুর, শিং ইত্যাদি। এসব মাছ জিয়ল মাছ হিসেবে পরিচিত। বাজারে নানা জাতের মাছ পাওয়া যায়। সব মাছ কিন্তু দেখতে একরকম নয়। বাজারে দেখা যায় এমন কয়েকটি তাজা মাছ লক্ষ্য করলে বিভিন্ন মাছের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়। তবে সাধারণভাবে মাছে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়, সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

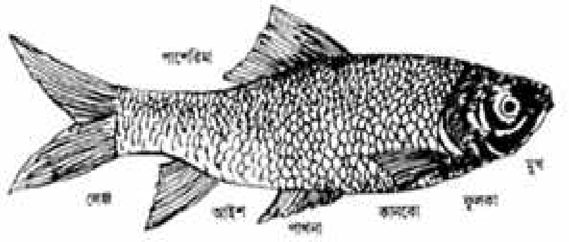

চিত্র ১ : মাছের চিহ্নিত চিত্র

মুখ

মাছের মাথার একেবারে সামনের দিকে একটি মুখ (mouth) রয়েছে। এই মুখে উপরের ও নিচের অংশে উর্ধ্ব ও নিম্ন চোয়াল নামে দুটি অস্থিময় অংশ যুক্ত থাকে। মুখের অবস্থান দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এই দুটি চোয়ালের গুরুত্ব অত্যধিক। কোন কোন মাছের এই দুটি চোয়ালে দাঁত থাকে আবার অনেক মাছের চোয়ালে কোন দাঁত থাকে না। চোয়ালে দাঁত রয়েছে এমন মাছের উদাহরণ হিসেবে বোয়াল, শোল, টাকি, গজার প্রভৃতি মাংসাশী মাছের কথা বলা যেতে পারে। এসব মাছ খাদ্য হিসেবে অন্যান্য ছোট জাতের মাছ বা পোকামাকড় খেয়ে থাকে। দাঁতহীন মাছের মধ্যে আমাদের অতি পরিচিত রুই, কাতল, মৃগেল প্রভৃতি উদ্ভিদভোজী বা প্ল্যাঙ্কটনভোজী মাছের কথা বলা যেতে পারে।

চোখ

মাছের মুখের কিছুটা উপরে মাথার দুপাশে একটি করে মোট দুটি চোখ (Eye) রয়েছে। চোখের সাহায্যে মাছ তার সামনের দিকে বেশ খানিকটা অংশে অবস্থিত খাদ্যবস্তু, শত্রু ইত্যাদি সহজেই সনাক্ত করতে পারে।

কানকো

মাছের মাথার পেছনের দিকে দুপাশে দুটি শক্ত হাড়ের তৈরি ত্রিকোণাকার ঢাকনা থাকে। এই ঢাকনাই কানকো (operculum) নামে পরিচিত। মাছ মুখ দিয়ে যে পানি দেহের ভেতর গ্রহণ করে, তা কানকো দিয়ে বাইরে বের করে দেয়। এভাবে মাছ তার শ্বসন অঙ্গ ফুলকাকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করে।

ফুলকা

মাছের কানকোর ঠিক নিচে ফুলকার (gills) অবস্থান। এটি অনেকটা লাল রঙের চিরুনীর মতো দেখতে। ফুলকার সাহায্যে মাছ শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য চালায়। অনেকের ধারণা মাছের শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য নাসারন্ধ্র ব্যবহার করে। কিন্তু কথাটা আসলে সত্যি নয়। নাসারন্ধ্র মাছের শ্বাসকার্যে তেমন কোন কাজেই লাগে না।

আঁইশ

সাধারণত মাছের দেহ আঁইশ (scale) দিয়ে ঢাকা থাকে। সামনের আঁইশ ক্রমান্বয়ে পেছনের আঁইশকে বেশ খানিকটা ঢেকে রাখে। এসব আঁইশ মাছের দেহকে বিভিন্ন ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা করে। আঁইশ ছাড়াও মাছের দেহে একজাতীয় পিচ্ছিল তরল পদার্থ থাকে এ পিচ্ছিল পদার্থটিকে শ্লেষ্মা (mucous) বলে। এ শ্লেষ্মা মাছের দেহকে বিভিন্ন জাতের পরজীবি এবং অন্যান্য রোগ- জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। অনেক মাছের দেহে কোন আঁইশ থাকে না। এ ধরনের মাছের মধ্যে শিং, মাগুর, বোয়াল, আইড়, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পার্শ্বরেখা অঙ্গ

মাছের দেহের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অঙ্গ হচ্ছে পার্শ্বরেখা অঙ্গ (lateral line organ)। এটি মাছের দেহের দুপাশে কানকোর শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে পুচ্ছ পাখনা বা লেজের শুরু যেখানে সেখান পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পার্শ্বরেখা অঙ্গের সাহায্যে মাছ সহজেই পানির বিভিন্ন গুণাগুণ, গভীরতা, বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারে। পার্শ্বরেখা মাছের দেহের ভারসাম্য রক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

পাখনা

মাছের দেহে সাঁতারের জন্য বেশ কয়েক ধরনের পাখনা (fin) রয়েছে। এসব পাখনা মাছের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। এসব পাখনা অনেকটা হাঁসের পায়ের মতো। সাধারণভাবে মাছের দেহে দুটি জোড়া পাখনা এবং তিনটি বেজোড় পাখনা রয়েছে। পাখনাগুলো হচ্ছে, পৃষ্ঠা পাখনা,বক্ষ পাখনা, পায়ু পাখনা, পুচ্ছ পাখনা ও শ্রেণী পাখনা। এসব পাখনার সাহায্যে খুব সহজেই মাছ পানিতে সাঁতার কেটে চলাচল করতে পারে।

পায়ুপথ

মাছের পেটের ঠিক পেছন দিকে লেজের কাছাকাছি অংশে একটি ছোট ছিদ্র রয়েছে। এটিই মাছের পায়ুপথ (anus) হিসেবে চিহ্নিত। এ পায়ুপথ দিয়েই মাছ বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়।

মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মাছের যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।সম্ভবত জলজ প্রাণীদের মধ্যে মাছের গুরুত্বই সর্বাধিক। মাছের বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বের মধ্যে খাদ্য হিসেবেই এর গুরুত্ব সর্বাধিক। তবে মাছের অন্যান্য অনেক গুরুত্বও রয়েছে। নিচে এসব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

(ক) খাদ্য হিসেবে মাছের গুরুত্ব

মাছের দেহে নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এসব উপাদানের মধ্যে আমিষ, স্নেহ, শর্করা, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি প্রধান। বিজ্ঞানীদের মতে, মাছ আমিষ জাতীয় খাদ্যের একটি প্রধান উৎস। দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মেধা ও মননের বিকাশেও আমিষ জাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব রয়েছে। আমিষ জাতীয় খাদ্য ছাড়াও মাছে বিভিন্ন ধরনের তেল, খনিজ পদার্থ, নানা প্রকার ভিটামিনসহ নানা ধরনের পুষ্টিকর পদার্থ রয়েছে। মূলত এ কারণেই পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মাছ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া মাছ সহজপাচ্য বিধায় শিশু থেকে শুরু করে যে কোন বয়সের লোক বা রোগী খুব সহজেই মাছ হজম করতে পারে এবং এতে দেহের আমিষের চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে নানা ধরনের পুষ্টি উপাদানের কারণে দেহে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। নিচে মাছের দেহ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদান দেহের কি কি কাজে লাগে, তা উল্লেখ করা হলো−

পুষ্টিকর উপাদান	কি কাজে লাগে	কোন মাছে পাওয়া যায়
আমিষ	দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধানের জন্য	বিভিন্ন ধরনের ছোট ও বড় মাছ।
তেল	হৃদরোগ প্রতিরোধক	নানা প্রজাতির তেলসমৃদ্ধ মাছ।
ভিটামিন এ	রাতকানা রোগ প্রতিরোধক	মলা, ঢেলাসহ নানা জাতের মাছে পাওয়া যায়
ভিটামিন ডি	রিকেট ও হাড় দুর্বলতা প্রতিরোধক	বিভিন্ন প্রকার মাছের তেলে পাওয়া যায়
ক্যালসিয়াম	দাঁত ও দেহের অস্থি ক্ষয়রোধক	মলা, ঢেলাসহ নানা জাতের মাছে পাওয়া যায়
ফসফরাস	দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা প্রতিরোধক	পুঁটি মাছ ও বিভিন্ন জাতের ছোট মাছে পাওয়া যায়।
আয়োডিন	গলগন্ড, মানসিক রোগ-প্রতিরোধক	বিভিন্ন জাতের সামুদ্রিক মাছে পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাছ শুধু যে দেহের পুষ্টি চাহিদাই পূরণ করে, তা নয়, বিভিন্ন ধরনের রোগ-প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও মাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

(খ) অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাছের ভূমিকা বেশ ব্যাপক। মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে নিচে আলোচনা করা হলো।

(১) কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে মাছের গুরুত্ব

কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে মাছের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী মাছ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত। এদেশে মাছ সংগ্রহ, মাছ সংরক্ষণ, মাছ বিপণন, মাছের পোনা উৎপাদন ইত্যাদি খাতে প্রায় ১ কোটি লোক সম্পৃক্ত রয়েছে।এদের মধ্যে ১২-১৫ লক্ষ সরাসরি মৎস্য সম্পদ থেকে জীবিকা অর্জন করছে। এছাড়াও বেকার সমস্যা দূরীকরণে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মাছ চাষ করার মাধ্যমে মৎস্য সেক্টর বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

(২) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উৎস হিসেবে মাছের গুরুত্ব

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের মাছ ও মাৎস্যজ প্রাণী রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে মাছ ও মৎস্যজ প্রাণী রপ্তানি করে বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে, তা বাৎসরিক রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭ শতাংশ। শুধু তাই নয়, মাছ দেশের রপ্তানিযোগ্য পন্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানও অধিকার করেছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর যেসব মাছ ও মৎস্যজ পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়, তার মধ্যে জীবিত মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ইত্যাদি প্রধান। এর মধ্যে চিংড়িজাতীয় পণ্যকে সাদা সোনা হিসেবেই অভিহিত করা হয়।

মৎস্য সম্পদহ্রাসের কারণ :

বাংলাদেশ মাছ ও মৎস্য সম্পদে পরিপূর্ণ থাকলেও নানা কারণে এ সম্পদ ক্রমান্বয়েই হ্রাস পাচ্ছে। মৎস্য বিশেষজ্ঞরা এ সম্পদ হ্রাসের জন্য প্রধানত দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন, যা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলে-

ক) প্রাকৃতিক কারণ এবং

খ) কৃত্রিম কারণ

নিচে এসব কারণ বিশদভাবে আলোচনা করা হলো :

(ক) প্রাকৃতিক কারণ : পরিবেশের নানা প্রতিকূলতার কারণে দেশের বিভিন্ন ছোট ও বড় জলাশয়ে মাছের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এসব কারণকে প্রাকৃতিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রাকৃতিক বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, আভ্যন্ড্রীণ বদ্ধ জলাশয়সহ সমুদ্রোকূলবর্তী এলাকার মাছের পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। মাছের পরিমাণ হ্রাসের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা যেসব কারণ উল্লেখ করেছেন, তা হলো :

১। পলিকরণ প্রক্রিয়া : প্রতিবছর বন্যা, নদী ভাঙন প্রভৃতি কারণে পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ক্রমান্বয়েই নদীসহ দেশের বৃহদাকার জলাশয়সমূহ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। শুধু পলি জমাটকরণই নয়, পলি প্রবাহের কারণেও মাছের স্বাভাবিক বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পলিকরণ প্রক্রিয়ার কারণে নদ-নদীতে ছোট-বড় নানা আকারের চর সৃষ্টি হয়। এতেও জলাশয়ের পরিবেশের অবনতি হয়। এ কারণে মাছের ডিম ও পোনা উৎপাদন এবং পক্ষান্ড় রে মাছের উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

২। পানির পরিমাণ হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া : দেশের বিভিন্ন বৃহদাকার নদ-নদীতে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং না করানোর ফলে নদীর তলদেশ ক্রমশই উঁচু হয়ে পড়ছে, ফলে নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এ কারণে মাছের পরিমাণ তো হ্রাস পাচ্ছেই, উপরন্তু এ প্রক্রিয়ায় অনেক মাছই প্রকৃতি থেকে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের যে অবনতি হচ্ছে, তার ফলে মাছের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

৩। খরা : খরা ও মরুকরণ প্রক্রিয়ার কারণে অনেক নদী-নালা, খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এতেও মাছের বংশ বৃদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্তিসহ মাছ নানা ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে, বিশেষত জলাশয় সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে, ক্রমশই পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

৪। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস : দেশের বিভিন্ন স্থানে মরুকরণ প্রক্রিয়ার কারণে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। বৃষ্টিপাত যেহেতু মাছের পোনা উৎপাদনের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃত, সেহেতু পরিমাণমত পোনা না হওয়ার কারণে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

(খ) মানুষের নানা ধরনের কর্মকান্ডের ফলে মাছের উৎপাদন ও মাছের রেণু ও পোনার উৎপাদনও অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। এসব কারণই মানবসৃষ্ট বা কৃত্রিম কারণ নামে পরিচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের এসব কর্মকান্ড এতটা ব্যাপক এবং সংহারক যে, তা প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। নিচে মাছ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নানা ধরনের কর্মকান্ডের বিবরণ এবং এসবের জন্য মাছের উৎপাদন যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা আলোচনা করা হলো।

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধি : জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির কারণে মাছের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের জলাশয়সমূহ পূর্বের চেয়ে অনেকাংশ কমে যাচ্ছে।এর ফলে প্রতিনিয়ত জলাশয়সমূহে যে চাপ পড়ছে,তা পরোক্ষভাবে মাছের উৎপাদনের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

২। মাছের চাহিদা বৃদ্ধি : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের চাহিদাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একেই তো জলাশয়ের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, তদুপরি ক্রমহ্রাসমান জলাশয় থেকে আশানুরূপ মাছের উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে মাছের চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্যজীবিরা জলাশয়ে পোনা বা ডিমওয়ালা মাছ যাই পাচ্ছে ধরে নিয়ে এসে বাজারজাত করছে। এতে সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

৩। জলাশয়ের চারিত্রিক পরিবর্তন : জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাসযোগ্য স্থানের অভাব দেখা দেওয়ায় জলাশয়সমূহে ক্রমশই ভরাট করে বাসযোগ্য স্থানে পরিবর্তন করা যাচ্ছে। এছাড়াও অনেক জলাশয়কে কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তিত করা হচ্ছে। এর ফলেও মাছের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে।

৪। কীটনাশক প্রয়োগ : বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রের অবস্থান জলাশয়সমূহের কাছাকাছি। ফলে কৃষিক্ষেত্রে বালাইনাশক হিসেবে যেসব কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে, তা সহজেই সেচের পানির মাধ্যমে জলাশয়ে পতিত হচ্ছে। এতে জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। মারা যাচ্ছে ডিমযুক্ত মাছ। অনেক মাছ কীটনাশকের তীব্রতায় নিজেদের স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র পাড়ি দিচ্ছে। এসব কারণেও মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

৫। কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ নিঃসরণ : বাংলাদেশের অনেক নদী এবং জলাশয়ের আশেপাশে নির্মাণ করা হয়েছে নানা ধরনের কলকারখানা। এসব কলকারখানা থেকে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ নিঃসৃত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে। এ কারণেও জলাশয়ে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ব্যাপকভাবে।

৬। সেচ ও বাঁধ নির্মাণ : দেশের বিভিন্ন স্থানে জলাশয়ে কৃষি সুবিধার জন্য নানা ধরনের ছোট-বড় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। অনেক মাছের চলাচলের সুবিধার জন্য ফিশ পাস নির্মাণ করা হয়েছে। এসব কৃত্রিম স্থাপনা মাছের উৎপাদন হ্রাসের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, ফলে মাছের উৎপাদনও যথেষ্ট হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের কারণে মাছ বিচরণের জন্য প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। এ কারণও মাছের উৎপাদন হ্রাস করার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে।

মৎস্য সম্পদ হ্রাসের প্রতিকার

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ বিভিন্নভাবে হ্রাস পাচ্ছে এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেশের বৃহত্তর চাহিদা পূরণের লক্ষে এসব সমস্যা দূর করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মৎস সম্পদ হ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কিন্তু মাছের উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এ ব্যাপারে দেশের মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বেশ চিন্তিত। এ সমস্যা দূরীকরণে নানা

ধরনের সুপারিশ রয়েছে। এসব সুপারিশকে আলোচনার সুবিধার্থে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

(১) মাছের বাসস্থান উন্নয়ন এবং (২) সমন্বিত মাছ চাষ কার্যক্রম। নিচে এসব বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(১) মাছের বাসস্থান উন্নয়ন : মাছের বাসস্থান উন্নয়ন করে মাছের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশের মাছের বাসস্থানকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– (ক) বদ্ধ জলাশয় (খ) মুক্ত জলাশয় এবং (গ) উপকূলীয় জলাশয়। খুব সহজেই এসব বাসস্থান উন্নয়ন করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সরকার বিভিন্ন উপায়ে এসব বাসস্থান সংস্কার এবং উন্নয়ন করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এতে মৎস্য সম্পদ হ্রাসের পরিমাণ অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। সরকারের সাথে অবশ্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিচে সরকার এবং এসব প্রতিষ্ঠানের গৃহীত প্রচেষ্টা উল্লেখ করা হলো।

(ক) বদ্ধ জলাশয় : বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপক সুফল পাওয়া গেছে। এর ফলে মাছের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি মৎস্য সম্পদ হ্রাসের আশংকাও অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে। এসব গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে– দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত এবং চাষযোগ্য খাল-বিল, নদী-নালা, হাওড়-বাওড়, দিঘি-পুকুর ও ডোবাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা ধরনের উচ্চফলনশীল মাছের চাষাবাদ করা হচ্ছে। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পোনা সরবরাহের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়েছে।

হাজামাজা পুকুর সংস্কার করে সেখানে মৌসুমী পর্যায়ে হলেও মাছ চাষাবাদ করার জন্য জনসাধারণকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে।এ জন্য সরকারি পর্যায়ে দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। চাষাবাদের মূলধন জোগাড়ের জন্য সরকার থেকে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) মুক্ত জলাশয় : বাংলাদেশে বিস্তৃত মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের সংস্কারমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। যেমন–

দেশের বিভিন্ন মুক্ত জলাশয়ে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির উচ্চ ফলনশীল মাছের পোনা অবমুক্ত করা হচ্ছে। একই সাথে মৎস্য সম্পদ ধ্বংস যাতে না হয়, সেজন্য মৎস্য সম্পদ আইনের প্রয়োগ জোরদার করা হয়েছে। নদ-নদীসহ বৃহদাকার জলাশয়ে মাছের অভয়ারণ্য সৃষ্টির মাধ্যমে মাছের পরিভ্রমণ এবং বিচরণ নিশ্চত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে কয়েক প্রজাতির মাছ, ডিমযুক্ত মাছ এবং নির্দিষ্ট আকারের কয়েক প্রজাতির মাছের পোনা সংগ্রহ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধনকারী কারেন্ট জালের ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এ জাল ব্যবহারকারীদের জেল জরিমানাসহ নানা ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

(গ) উপকূলীয় জলাশয় ঃ- বাংলাদেশের বিস্তৃত উপকূলীয় এলাকাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও নানা ধরনের সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব এলাকায় প্রধানত বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি চাষাবাদ করা হয়।চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের সাথে সাথে এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারি স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া চিংড়ির সাথে অন্যান্য প্রজাতির মাছও চাষের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। চিংড়ির সাথে চাষযোগ্য এসব মাছ সাধারণভাবে সাদা মাছ হিসেবে পরিচিত।

২। সমন্বিত মাছ চাষ কার্যক্রম : বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ এলাকাতে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোসমূহ নানাভাবে মাছের প্রজনন এবং বংশ বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব জলাশয়ে নানাজাতের মাছের পোনা অবমুক্ত করার মাধ্যমে অধিক মাছ ফলাও অভিযান বেশ জোরেসোরেই চলছে। বিভিন্ন খাল-বিল ও ছোটখাটো গর্তে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের দিকে সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও বেশ জোর দিচ্ছেন। এতে মাছের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটছে। শুধু তাই নয়, দেশে বিভিন্ন চাষোপকরণ ব্যবহার করার মাধ্যমে সমন্বিত মাছ চাষ কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হয়েছে। অনেক স্থানে ধানের সাথে মাছ চাষ, হাঁস বা মুরগীর সাথে মাছ চাষ, গবাদি পশুর সাথে মাছ চাষ, মুক্ত ও মাছ চাষ, শৈবাল ও মাছ চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম ও হাতে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এসব কার্যক্রম প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরীক্ষামূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এসব কার্যক্রম সুফলদায়ক বলে প্রামণিত হয়েছে। একইসাথে সরকারি মালিকাধীন খাস জমি এধরনের মাছ চাষে বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে মাছের উৎপাদনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে চলছে সমন্বিত মাছ কার্যক্রমের উপযোগিতা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম।

সারমর্ম

- বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ মাছ।
- এদেশের মানুষের দৈনিক পুষ্টি চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে।
- মাছ চাষের জন্য এদেশের জলবায়ু খুবই উপযোগী।
- বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষ মাছ চাষের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।
- মাছ বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে মাছ চাষের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দেশে বিভিন্ন জলাশয়ে নানাজাতের মাছের পোনা ছেড়ে মাছ চাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে।
- সমন্বিত মাছ চাষ কার্যক্রম পরীক্ষামূলক হলেও নানাস্থানে এটি সুফলদায়ক হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। মাছ দেশের কোন ধরনের ফসল?

(ক) অর্থকরী ফসল (খ) সম্ভাবনাময় ফসল
(গ) অলাভজনক ফসল (ঘ) কোনটাই নয়

২। মাছ কোন ধরনের পুষ্টি যোগায়?

(ক) আমিষজাতীয় (খ) স্নেহজাতীয়
(গ) শর্করাজাতীয় (ঘ) ভিটামিনজাতীয়

৩। চলাচলের জন্য মাছের দেহে কি রয়েছে ?

(ক) পাখনা (খ) কানকো
(গ) পার্শ্বরেখা (ঘ) কোনটাই নয়

৪। বাংলাদেশের মোট কত লোক মাছ সম্পর্কিত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত?

(ক) এক লক্ষ লোক (খ) দশ লক্ষ লোক
(গ) এক কোটি লোক (ঘ) দশ কোটি লোক

পাঠ-৭.২ : মৎস্য সংরক্ষণ আইন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মৎস্য আইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আইন ও বিধি জানতে পারবেন।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য জলাশয়, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং বিপুল সংখ্যক মৎস্যজীবী রয়েছে। এসবের মধ্যকার কর্মকান্ড এবং আন্তঃক্রিয়া সূচারুভাবে পরিচালনার জন্য একটি আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে মৎস্য প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৫০ নামে একগুচ্ছ বিধিমালা তৈরি করা হয়। এই বিধিমালা পরবর্তীতে কালের সাপেক্ষে আরও পরবর্তিত হয়ে নতুন নতুন সংযোজনের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু নীতিমালা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের জলাশয়সমূহে মাছের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অপরিকল্পিতভাবে ডিমযুক্ত মাছ ধরা, পোনা মাছ ধরা, বিভিন্ন ধরনের অবৈধ উপকরণ, যেমন– বিস্ফোরক, কারেন্ট জাল ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরা, বৃহদাকার জলাশয়ে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমকে। এসব কার্যক্রম মাছ সংরক্ষণের দিক থেকে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত। অবৈধ এবং মৎস্য সম্পদ বিনষ্টকারী এসব কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্যই মৎস্য সংরক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো :

(ক) মাছের আবাসভূমি সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা:
(খ) জলাশয় থেকে মাছ ধরার ব্যাপারে সুষ্ঠু নিয়মনীতির প্রয়োগ:
(গ) মাছ, মাছের আবাসস্থল ইত্যাদির প্রতি মৎস্যজীবী ও আমজনতার সচেতনতা সৃষ্টি:
(ঘ) মৎস্য সংক্রান্ত সকল প্রকার অবৈধ কার্যক্রম থেকে সবাইকে বিরত রাখা এবং
(ঙ) মাছের পরিবেশগত উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে মৎস্যজীবীসহ আমজনতাকে সম্পৃক্ত করা।

মৎস্য প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনের নীতিসমূহ

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মৎস্য প্রতিরক্ষণা ও সংরক্ষণ অ্যাক্ট, ১৯৫০ নামে একগুচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে এ নীতিমালা বাংলাদেশেও প্রচলন করা হয়। এই অ্যাক্টে ৮টি ধারা রয়েছে। পরবর্তীতে অবশ্য ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৮৫ সালে এসব বিধিতে প্রয়োজন এবং সময়ানুগ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণভাবে এসব নীতিমালা মৎস্য আইন নামে পরিচিত। এই আইনের বিশেষ ধারাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে (নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস) ২৩ সেন্টিমিটার বা নয় ইঞ্চি বা তার চেয়ে ছোট আকারের ইলিশ মাছ (যা জাটকা নামে সমধিক পরিচিত) ও পাঙ্গাস মাছ ধরা, পরিবহন ও বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

২। মধ্য আষাঢ় মাস থেকে মধ্য পৌষ মাস (জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস) ২৩ সেন্টিমিটার (নয় ইঞ্চির চেয়ে ছোট) বা তার চেয়ে ছোট আকারের রুই, কাতল, কালবাউশ, ঘনিয়া প্রভৃতি মাছ ধরা, পরিবহন ও বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

৩। মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময়ে (ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত) ৩০ সেন্টিমিটার (বারো ইঞ্চি) বা তার চেয়ে ছোট পাঙ্গাস, শিলং, বোয়াল, আইড় প্রভৃতি মাছ ধরা, পরিবহন ও বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

৪। প্রজনন মৌসুমে অর্থাৎ চৈত্র মাসের প্রথম থেকে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি (১৫ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই) পর্যন্ত দেশের কিছু নির্দিষ্ট নদ-নদী, খাল-বিলসহ বিভিন্ন জলাশয়ে যে কোন আকারের রুই তথা কার্পজাতীয় মাছ ধরা, পরিবহন ও বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

৫। এপ্রিল মাসের শুরু থেকে আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত মুক্ত জলাশয়ে বোয়াল, গজার ও টাকি মাছের রেনু পোনা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে চলাচল করে, তখন এসব পোনা ও এদের সাথে বিচরণকারী অন্য মাছ ধরা, পরিবহন ও বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

৬। নদ-নদীসহ বৃহদাকার জলাশয়ে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে বা স্থায়ীভাবে জাল পেতে মাছ ধরা বা মাছের স্বাভাবিক চলাচলে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

৭। বিস্ফোরক দ্রব্য, বন্দুক, তীর, বর্শা ইত্যাদি মারণাস্ত্র ব্যবহার করে বা জলাশয়ে বিষ প্রয়োগ করে মাছের আবাসস্থল বা প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট করা আইনগত দন্ডনীয়।

৮। মৎস্য সংরক্ষণ আইন অমান্যকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রথমবারে কৃত অপরাধের জন্য ১,০০০ (এক হাজার টাকা জরিমানা) বা ৬ মাসের জেল বা উভয় ধরনের দন্ড প্রদান করা যেতে পারে। পরবর্তীতে একই ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তির পরিমাণ দিগুণ হবে। মোটামুটিভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০-এ বর্ণিত এবং সর্বসাধারণে প্রচলিত নীতিমালাসমূহের সারসংক্ষেপ উপরে দেয়া হলো।

অন্যান্য সম্পূরক আইন

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ ছাড়া একাধিক সম্পূরক আইন বা নীতিমালা প্রচলিত রয়েছে। এসব আইন বা নীতিমালার মধ্যে পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯ সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩; চিংড়ি চাষ আইন, ১৯৯২ ইত্যাদি উলে- খযোগ্য। নিচে এসব আইন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো :

(ক) পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯

১৯৩৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে পুকুর উন্নয়ন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অবশ্য পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনে সংযুক্ত বিভিন্ন নীতি হচ্ছে–

- অধিগ্রহণকৃত পুকুরটিতে মাছ চাষে আগ্রহী স্থানীয় কোন সংস্থা, সমিতি বা ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট সময়ের (অনধিক বিশ বছর) জন্য হস্তান্তর করবেন।
- সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকাকালীন মালিক পুকুরটির জন্য সরকার নির্ধারিত খাজনা পাবেন।
- পুকুর থেকে ২৩ সেন্টিমিটারের চেয়ে কম আকারের পোনা মাছ ধরা যাবে না।
- যেসব জালের ফাঁস ৪৫ সেন্টিমিটার বা তার কম (যেমন, কারেন্ট জাল), সেসব ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

- মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রথমবার অমান্যকারীর জন্য ১,০০০ (এক হাজার টাকা) জরিমানা বা ৬ মাসের জেল বা উভয় ধরনের শাস্তি হতে পারে।
- মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য ডিসি বা থানা নির্বাহী কর্মকর্তা হাজা-মজা পুকুরের মালিককে পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষ করার জন্য নোটিশ দেবেন।
- হাজা-মজা পুকুর সংস্কারের নোটিশ পাওয়ার পরও যদি পুকুরটির সংস্কার না করেন, তবে পুকুরটিকে পতিত হিসেবে ঘোষণা করে তা অধিগ্রহণ করবেন।

(খ) সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ১৯৮৩

বাংলাদেশের বিস্তৃত তটরেখা বরাবর ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের পরিমাণ ১.৬৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রোপকূলবর্তী এ এলাকা থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ মাছ সংগ্রহ করা হয়। এ বিস্তৃত এলাকা থেকে কিভাবে মাছ সংগ্রহ করা হবে, কি উপকরণ ব্যবহার করা হবে, কোন ধরনের মাছ সংগ্রহ করা হবে এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নিয়ে এ আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা হয়।

(গ) চিংড়ি চাষ আইন, ১৯৯২

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ এবং উপকূলবর্তী এলাকাতে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি চাষাবাদের জন্য ১৯৯২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার চিংড়ি চাষ আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-

- চিংড়ি চাষোপযোগী এলাকাতে সরকার চিংড়ি চাষ এবং চাষাবাদ কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করবেন।
- চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির মালিকগণ নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মমাফিক বিভিন্ন কর পরিশোধ করবেন।

সারমর্ম

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মাছের বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডে নানা ধরনের আইন প্রচলিত রয়েছে। এসব আইন ঠিকমতো মেনে চললে, দেশে মাছের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি ভোক্তাদের চাহিদাও সুনির্দিষ্ট থাকবে। তবে এক্ষেত্রে মাছ বা মাছ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার নিয়ম-নীতিও মেনে চলা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মৎস্য সংরক্ষণ আইন কবে প্রবর্তিত হয়েছে?

(ক) ১৯৪৩ সালে (খ) ১৯৮৮ সালে

(গ) ১৯৫০ সালে (ঘ) ১৯৯৬ সালে

২। কত সেন্টিমিটার পর্যন্ত রুইজাতীয় মাছ ধরা নিষিদ্ধ?

ক) ১২ সেন্টিমিটার (খ) ২৫ সেন্টিমিটার

(গ) ১৮ সেন্টিমিটার (ঘ) কোনটাই নয়

পাঠ- ৭.৩ : বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতের মাছ চিনতে ও মাছের পরিচয় দিতে পারবেন।
- স্বাদু পানি ও লোনা পানির পরিচিত মাছের নাম বলতে পারবেন।
- চাষোপযোগী মাছের গুণাগুণ উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অঞ্চলে নানা ধরনের জলাশয় রয়েছে। তবে ধরন অনুযায়ী এসব জলাশয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন–

(ক) স্বাদু পানি;
(খ) লোনা পানি এবং
(গ) খাড়ি এলাকা।

উপরোক্ত জলাশয়সমূহে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। অনেক সময় এক ধরনের জলাশয়ের মাছ অন্য ধরনের জলাশয়ে পাওয়া গেলেও প্রায় প্রতিটি জলাশয়ের পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে মাছের ধরনও কিছুটা পৃথক হয়। নিচে বিভিন্ন জলাশয় কি কি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা হলো :

(ক) স্বাদু পানির মাছের প্রজাতি : বাংলাদেশের স্বাদু পানির পরিবেশে যেসব জলাশয়কে চিহ্নিত করা হয়, তার মধ্যে নদ-নদী, খাল-বিল, দিঘি, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি অন্যতম। এসব জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো মাছ ছাড়াও অনেকক্ষেত্রে মাছ চাষাবাদ করা হয়। মাছের যেসব প্রজাতি এক্ষেত্রে চাষাবাদ করা হয়, তার মধ্যে রুই জাতীয় মাছ, যেমন– কাতলা, রুই, মৃগেল, কালবাউশ প্রধান। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ জাতীয় মাছ খুব বেশি চাষাবাদ করা হয়। পূর্বে এ জাতীয় মাছ স্বাদু পানির বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও বর্তমানে এর পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ায় এসবের চাষাবাদ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মাছের মধ্যে বিদেশী রুই জাতীয় মাছ যেমন– সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, মাড কার্প, কার্পিও, শোল, গজার, টাকি, মাগুর, শিং, কৈ, মলা, ঢেলা, বিভিন্ন প্রজাতির পুঁটি মাছ ইত্যাদি প্রধান। এসব মাছের মধ্যে শিং, কৈ, ঢেলা, মলা, মাগুর ইত্যাদি মাছ ছোট আকারের জলাশয়ে বেশি চাষাবাদ করা হয়।

(খ) লোনাপানির মাছের প্রজাতি : লোনা পানির পরিবেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের লোনা পানির পরিবেশ অন্যতম। এ অঞ্চলে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। তবে এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাছ হলো, বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ, রূপচান্দা, ছুরি, দাতিনা, পোয়া, কোড়াল, লইট্ট্যা, বিভিন্ন প্রজাতির হাঙর, ইত্যাদি।

(গ) খাড়ি এলাকার মাছের প্রজাতি : বাংলাদেশের খাড়ি এলাকা হলো বিভিন্ন নদীর মোহনা। এসব অঞ্চলেও নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ হলো : ভেটকি, পোয়া ইত্যাদি।

চাষোপযোগী মাছ

বাংলাদেশের জলাশয়সমূহের নানা প্রজাতির মাছের মধ্যে সবগুলোই কিন্তু চাষোপযোগী নয়। তবে অনেক প্রজাতির মাছই বিভিন্ন জলাশয়ে চাষাবাদ করা যেতে পারে। পরিচিত অনেক মাছই চাষাবাদের উপযোগী নয়।কোন কোন প্রজাতির মাছ বাংলাদেশের জলাশয়ে

চাষোপযোগী, মৎস্যবিজ্ঞানীরা তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন।বাংলাদেশের অতি পরিচিত মাছের মধ্যে কোনগুলো চাষোপযোগী আর কোনগুলো চাষোপযোগী নয়, তা পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।

চাষোপযোগী মাছ

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প, কমন কার্প, নাইলোটিকা, তেলাপিয়া, রাজপুঁটি, পাঙ্গাস, বিদেশী মাগুর, দেশী মাগুর, শিং, সরপুঁটি ইত্যাদি।

চাষোপযোগী নয় এমন মাছ

চান্দা, ইলিশ, লইট্ট্যা, হাঙ্গর, ছুরি, বেলে, দাতিনা, কোড়াল ইত্যাদি।

চাষোপযোগী মাছের গুণাগুণ

চাষোপযোগী মাছের বিভিন্ন ধরণের গুণাগুণ রয়েছে। কোন মাছ চাষোপযোগী কিনা তা তিনটি মূল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এসব বিষয় হলো : (ক) মাছের বৈশিষ্ট্য (খ) চাষাবাদের উপযোগিতাঃ এবং (গ) মাছের উপযোগিতা। নিচে এসব বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো :

(ক) মাছের বৈশিষ্ট্য

(১) মাছ খুব দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে

(২) জলাশয়ে স্থান ও খাদ্যের জন্য অন্য মাছের সাথে কোন প্রতিযোগিতা করে না বা করলেও তেমন মারাত্মক নয় ।

(৩) সহজে কোনপ্রকার রোগ ও পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় না

(৪) প্রাকৃতিক খাদ্য ছাড়াও সম্পূরক খাদ্য সহজেই গ্রহণ করতে পারে।

(খ) চাষাবাদগত উপযোগিতা

(১) কম স্থানে বেশি সংখ্যায় চাষাবাদ করা যায়।

(২) প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সহজেই মাছের পোনা পাওয়া যায়।

(৩) কৃত্রিম উপায়ে মাছের পোনা উৎপাদন করা যায়।

(৪) পোনা পরিবহন করা সহজ।

(গ) মাছের উপযোগিতা

(১) খেতে সুস্বাদু।

(২) বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

যেসব মাছে উল্লেখিত গুণাগুণ রয়েছে, সাধারণভাবে সেসব মাছই চাষোপযোগী মাছ হিসেবে চিহ্নিত।

বিভিন্ন চাষোপযোগী মাছ পরিচিত

পূবেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জলাশয়ে নানা প্রজাতির চাষোপযোগী মাছ রয়েছে। এসব মাছের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাছের বিস্তারিত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

(১) কার্প জাতীয় মাছ

দেশী ও বিদেশী রুই জাতীয় মাছকে সাধারণভাবে কার্প নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য কার্পকে আবার মেজর কার্প এবং মাইনর কার্প-এই দুভাগে ভাগ করা হয়। দেশী মেজর কার্পের মধ্যে উলে-খযোগ্যগুলো হলো রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবাউশ, অন্যদিকে বিদেশী মেজর কার্পের মধ্যে কার্পিও, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প,

কমন কার্প ইত্যাদি প্রধান। অন্যদিকে মাইনর কার্পের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পুঁটি মাছ, যেমন– সরপুঁটি, জাতিপুঁটি, চোলাপুঁটি, ইত্যাদি প্রধান।

কার্প জাতীয় মাছ সাধারণত জলাশয়ের বিভিন্ন স্তর (যেমন উর্ধ্বস্তর, মধ্যস্তর এবং নিম্নস্তর) থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এসব মাছ একক এবং মিশ্রভাবে চাষাবাদ করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন পুকুরের সব খাবার সমানভাবে ব্যবহৃত হয় তেমনি জলাশয়ের পরিবেশও ভালো থাকে। বাংলাদেশে কার্প জাতের মাছ একক বা মিশ্র পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হয়ে থাকে। এ পাঠে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু চাষোপযোগী কার্প মাছের বর্ণনা দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী মাছের পরিচিতি পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলো।

দেশী চাষযোগ্য মাছ

রুই

এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Labeo rohita*। রুই মাছ সাধারণত স্বাদু পানির বাসিন্দা। এ মাছ বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর বাজার মূল্যও যথেষ্ট। এটি দেশের অন্যতম চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃত।

দেহগঠন : রুই মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় কিছুটা ছোট। দেহের উপরিভাগের তুলনায় দেহের নিচের অংশ খানিকটা বাঁকানো। রুই মাছের পিঠের দিকের রং কিছুটা বাদামি হলেও পেটের উভয় দিকের রং হালকা সোনালী বর্ণের। রুই মাছের ঠোঁট বেশ পুরু, ঠোঁটের কিনারা বা প্রান্তভাগে বেশ কিছু সূক্ষ্ম খাঁজ রয়েছে। ঠোঁটের আগায় একজোড়া ছোট কিন্তু মাংসল শুঁড় রয়েছে। এ মাছের লেজ বেশ ভালোভাবে দ্বিখন্ডিত এবং খানিকটা ছড়ানো ধরনের।

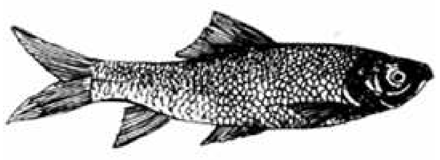

চিত্র : রুই মাছ

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : রুই মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ে অবস্থানরত বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটন। এরা সাধারণত জলাশয়ের মধ্যস্তর থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকে। মূলত এ কারণে রুই মাছকে স্তরভোজী (column feeder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।তবে বিজ্ঞানীদের মতে, প্রয়োজনে রুই মাছ খাদ্যের সন্ধানে জলাশয়ের উর্ধ্ব এবং নিম্নস্তরেও গমন করতে পারে। উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটন ছাড়াও রুই মাছ জলাশয়ে জন্মানো নানা ধরনের উদ্ভিদের পাতা, পঁচা জৈব আবর্জনা খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে রুই মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে।

পরিপক্বতা বা বংশবিস্তার : রুই মাছ সাধারণত বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য রুই মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথভাবে না হলে রুই মাছের প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে রুই মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তিন বছর বয়সে এ মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ২ থেকে ৩ লক্ষ ডিম ধারণ করতে

পারে। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত রুই মাছ ডিম পাড়ে। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে রুই মাছের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

কাতলা

এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Catla catla*। কাতলা মাছ রুই মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। এ মাছ বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। এটি দেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃত।

দেহগঠন : কাতলা মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। এ মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ বড়, অনেকক্ষেত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কাতলা মাছের দেহ চওড়া এবং খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। পিঠের দিকের রং ধূসর, পেটের দিকের রং সাদাটে। দেহের উপরিভাগ খানিকটা বাঁকানো। কাতলা মাছের পিঠের দিকের রং কিছুটা কালচে বর্ণের। কাতলা মাছের ঠোঁট বেশ পুরু, উপরের দিকে বাঁকানো এবং প্রাসরণক্ষম। এ মাছের লেজ বেশ ভালেভাবে দ্বিখন্ডিত এবং খানিকটা ছড়ানো ধরনের।

খাদ্য ও খাদ্যভ্যাস : কাতলা মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ে অবস্থিত নানা ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্ল্যাংকটন। এরা সাধারণত জলাশয়ের উপরের স্তর থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকে। মূলত এ কারণে কাতলা মাছকে ঊর্ধ্বস্তরভোজী (surface feeder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ছোট অবস্থায় কাতলা মাছ প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন ও খোলসযুক্ত ছোট ছোট প্রাণী খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে কাতলা মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে।

পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার : কাতলা মাছের মতোই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য কাতলা মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথভাবে না হলে কাতলা মাছের প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে কাতলা মাছ দৈর্ঘে প্রায় দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তিন থেকে পাঁচ বছরের বয়সে এ মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ১৫ থেকে ৩০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত কাতলা মাছ ডিম পাড়ে। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে কাতলা মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।

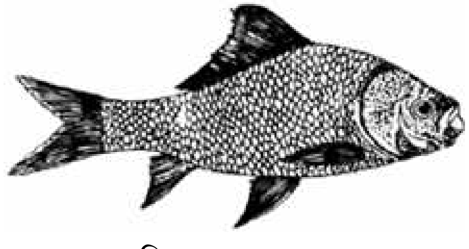

চিত্র : কাতলা মাছ

মৃগেল মাছ

এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Cirhinus mrigala*। মৃগেল মাছ রুই মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। মৃগেল মাছ বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-ডোবাতে

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। এটি দেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃত।

দেহগঠন : মৃগেল মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। মৃগেল মাছের দেহ খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। দেহের রং তামাটে বর্ণের তবে উভয় পাশে ও পেটের দিকের রং সোনালী। দেহের পৃষ্ঠভাগ খানিকটা বাঁকানো ধরনের। মৃগেল মাছের পাখনাগুলো কিছুটা লালচে বর্ণের। মৃগেল মাছের ঠোঁট নিচের দিকে বাঁকানো এবং ঠোঁটের দুপাশে একজোড়া শুঁড় রয়েছে।

খাদ্য ও খাদ্যাভাস : মৃগেল মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ের তলদেশে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ মূলত এ কারণে মৃগেল মাছকে নিম্নস্তরভোজী (bottom feeder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ছোট অবস্থায় মৃগেল মাছ প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের তলদেশের নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ, পচা আর্বজনা, কাদার মধ্যে জন্মানো বিভিন্ন ধরনের কীট, যাদের বেনথোস বলা হয় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে মৃগেল মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে।

পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার : মৃগেল মাছ রুই মাছের মতোই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য মৃগেল মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথ না হলে মৃগেল মাছের প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা যায় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে মৃগেল মাছ দৈর্ঘে প্রায় এক মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৮ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। দুই বছর বয়সে এই মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ১ থেকে ৫ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্যন্ত মৃগেল মাছ ডিম পাড়ে। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে মৃগেল মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।

কালবাউস মাছ : এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Labeo cailbasu*। কালবাউস মাছ রুই-কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে কালবাউস মাছ পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক মূল্য থাকায় এটি দেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেহগঠন : কালবাউস মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। কালবাউস মাছ দেখতে অনেকটা মৃগেল মাছের মতো। এ মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। কালবাউস মাছের দেহ খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। দেহের রং তামাটে বর্ণের তবে উভয় পাশে ও পেটের দিকের রং ধূসর সাদা। কালবাউস মাছের পাখনাগুলো কিছুটা কালচে বর্ণের। এ মাছের আঁইশগুলোর মাঝের অংশ সামান্য লাল কিন্তু কিনারগুলো কালচে বর্ণের। কালবাউস মাছের মুখ সরু এবং মুখে দুই জোড়া ছোট গোঁফ রয়েছে।

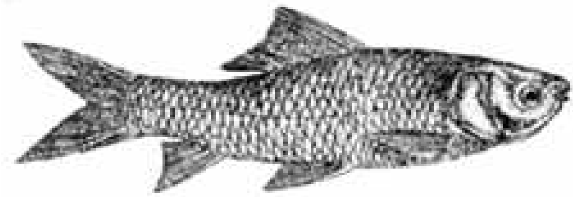

চিত্র ঃ কালবাউস মাছ

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : কালবাউস মাছ মৃগেল মাছের মতোই জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করে।এ মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ের তলদেশে অবস্থিত বিবিন্ন ধরনের পদার্থ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। মূলত এ কারণে কালবাউস মাছকেও নিম্নস্তরভোজী (bottom feeder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ছোট অবস্থায় কালবাউস মাছ প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের তলদেশের নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ, পচা আবর্জনা, কাদার মধ্যে জন্মানো বিভিন্ন ধরনের কীট, যাদের বেনথোস বলা হয় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে কালবাউস মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে। এক কথায় কালবাউস মাছকে সর্বভুক মাছ বলা যায়।

পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার : কালবাউস মাছ রুই-কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য কালবাউস মাছের বিশেষ কিছু পারিপার্শ্বিক বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথ না হলে কালবাউস সার্থকভাবে প্রজনন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। প্রাকৃতিক পরিবেশে কালবাউস মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৭ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। দুই বছর বয়সে কালবাউস মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ২ থেকে ৬ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে।সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কালবাউস মাছ নদ-নদীতে প্রজনন করে ও ডিম পাড়ে।বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশে কালবাউস মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।

বিদেশী চাষযোগ্য মাছ

সিলভার কার্প

এ মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Hypopthalmicthyes molitrix*। সিলভার কার্প রুই-কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা।

এটি মূলত চীন এবং রাশিয়ার নদ-নদীর মাছ। ১৯৬৯ সালে সিলভার কার্প সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আনা হয় এবং পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে এর চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে সিলভার কার্প মাছ পাওয়া যায়। এ মাছ খাদ্য হিসেবে যেমন সুস্বাদু, তেমনি এর অর্থনৈতিক মূল্যও রয়েছে। এটি সহজেই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেহগঠন : সিলভার কার্প মাছের দেহ লম্বাটে এবং স্রোতমুখীন। সিলভার কার্প মাছের দেহের নিচের অংশ অনেকটা নৌকার মতো দেখতে। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। সিলভার কার্প মাছের দেহ খানিকটা চ্যাপ্টা ধরনের এবং ছোট অবস্থায় দেখতে অনেকটা চাপিলা মাছের মতো। তবে মাঝারি অবস্থায় এ মাছ দেখতে অনেকটা ইলিশ মাছের মতো। দেহের উপরিভাগের রং কিছুটা কালচে বর্ণের হলেও দেহের উভয় পাশ ও পেটের দিকের রং খানিকটা ধূসরাভ রূপালী সিলভার কার্প মাছের দেহের আঁইশসমূহ ছোট এবং রূপালী বর্ণের।

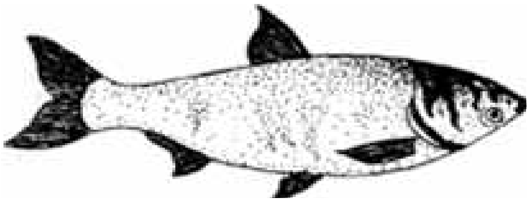

চিত্র : সিলভার কার্প

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস ঃ সিলভার কার্প মাছের খাদ্যাভ্যাস অনেকটা দেশী মাছ কাতলার মতো। এর জলাশয়ের ঊর্ধ্বস্তরে বসবাস করে। এই মাছের প্রধান খাদ্য জলাশয়ের ঊর্ধ্বস্তরে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন। মূলত এ কারণে সিলভার কার্প মাছকেও ঊর্ধ্বস্তরভোজী মাছ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ছোট অবস্থায় সিলভার কার্প মাছ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটন এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের নানা প্রজাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবাল ও পচা জলজ উদ্ভিদ খায়। চাষ করা হয় এমন জলাশয়ে সিলভার কার্প মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত খাদ্যের পাশাপাশি বাইরে থেকে সরবরাহ করা সম্পূরক খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে। এসব সম্পূরক খাদ্যে ভিটামিনসহ উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ থাকে।

পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার : সিলভার কার্প মাছ রুই-কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। প্রজননের জন্য সিলভার কার্প মাছের বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। এসব যথাযথভাবে না হলে সিলভার কার্প সার্থকভাবে প্রজনন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। প্রাকৃতিক পরিবেশে সিলভার কার্প মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৭ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। প্রায় দেড় বছর বয়সে সিলভার কার্প মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ৬ থেকে ৮ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত আষাঢ়- শ্রাবণ মাসে সিলভার কার্প মাছ নদ-নদীতে প্রজনন করে ও ডিম পাড়ে। ১৯৭৬ সালে এই মাছের কৃত্রিম প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে সিলভার কার্প মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে।

গ্রাস কার্প

এ মাছের বৈজ্ঞানিক নাম *Ctenopharyngodon idella*। গ্রাস কার্প মাছ রুই-কাতলা-মৃগেল মাছের মতোই স্বাদু পানির বাসিন্দা। এ মাছের মূল আবাসস্থল চীন এবং রাশিয়ার নদ-নদী। ১৯৯৬ সালে গ্রাস কার্প মূলত জলাশয়ের জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আনা হয় এবং পরবর্তীকালে এদেশে ব্যাপকভাবে এর চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি-ডোবাতে প্রচুর পরিমাণে গ্রাস কার্প মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এটি ঘেসো রুই নামে পরিচিত। এ মাছ খাদ্য হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এর যথেষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে। ফলে এটি খুব সহজেই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান চাষযোগ্য মাছ হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেহগঠন : গ্রাস কার্প মাছের দেহ বেশ লম্বাটে ধরনের এবং স্রোতমুখীন। গ্রাস কার্প মাছের দেহ দেখতে অনেকটা মৃগেল মাছের মতো। এদের পিঠের রং তামাটে হলেও দেহের অন্য অংশের রং ঈষৎ সবুজাভ ধরনের। গ্রাস কার্প মাছের পাখনা ছোট ধরনের। এই মাছের মাথা অপেক্ষাকৃত ত্রিকোণাকৃতি এবং দেহের তুলনায় বেশ ছোট। গ্রাস কার্প মাছের দেহ বেশ

চ্যাপ্টা এবং দেহ মাঝারি আকারে আঁইশ দিয়ে আবৃত। গ্রাস কার্প মাছের দেহের আঁইশসমূহ মাঝারি আকারের এবং রূপালী।

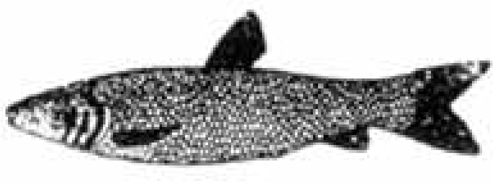

চিত্র : গ্রাস কার্প

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস : গ্রাস কার্প মাছের খাদ্যাভ্যাস ছোটবেলায় অনেকটা দেশী অন্যান্য মাছের মতোই। এসময় এরা উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন খেয়ে থাকে। তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের খাদ্যাভ্যাসও পরিবর্তিত হয়। ছোট অবস্থায় গ্রাস কার্প মাছ জলজ উদ্ভিদ ও ঘাসের কচি পাতা খেতে অভ্যস্থ এবং বড় অবস্থায় জলাশয়ের বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস খেতে অভ্যস্থ। চাষ করা হয় এমন ধরনের জলাশয়ে গ্রাস কার্প মাছ জলাশয়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের পাশাপাশি বাইরে থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদের টুকরো করা অংশ সরবরাহ করা হয়।

পরিপক্বতা ও বংশবিস্তার : গ্রাস কার্প মাছ অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের মতোই বদ্ধ জলাশয়ে ডিম দেয় না। বর্ষাকালে এটি প্রজনন করে। প্রজননের জন্য গ্রাস কার্প মাছের বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে গ্রাস কার্প মাছ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় ৭ থেকে ৯ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। প্রায় দেড় বছর বয়সে গ্রাস কার্প মাছ যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। একটি স্ত্রী মাছ প্রজনন ঋতুতে একবারে প্রায় ৬ থেকে ৮ লাখ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। সাধারণত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গ্রাস কার্প মাছ নদ-নদীতে প্রজনন করে ও ডিম পাড়ে। ১৯৮০ সালে এই মাছের কৃত্রিম প্রজনন সার্থকভাবে সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে গ্রাস কার্প মাছের পোনা উৎপাদনের কাজ চলছে। এসব মাছ ছাড়াও বাংলাদেশে আরও কিছু মাছ চাষযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত। এসব মাছের মধ্যে কমন কার্প প্রধান।

সারমর্ম

- বাংলাদেশের জলসম্পদ তিন ভাগে বিভক্ত।
- চাষযোগ্য মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং খেতে সুস্বাদু। রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালবাউস উল্লেখযোগ্য চাষযোগ্য দেশী মাছ।
- চাষযোগ্য বিদেশী মাছের মধ্যে সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কার্প উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। স্বাদু মাছ কোথায় পাওয়া যায়?

(ক) খাড়ি অঞ্চলে (খ) নদ-নদী, খাল-বিলে

(গ) উপকূলীয় জলাশয়ে (ঘ) মরুভূমিতে

২। রুই মাছ কোন স্তরের মাছ হিসেবে পরিচিত?

(ক) নিম্নস্তরের (খ) ঊর্ধ্বস্তরের

(গ) মধ্যস্তরের (ঘ) কোনটাই নয়

৩। কোনটি দেশী চাষযোগ্য মাছ?

(ক) কালবাউস (খ) সিলভার কার্প

(গ) গ্রাস কার্প (ঘ) কমন কার্প

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১ : ১। (খ) ২। (খ) ৩। (খ) ৪। (ঘ)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২ : ১। (গ) ২। (ঘ)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ : ১। (খ) ২। (গ) ৩। (ক)।